Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 9.134
Volume - 9, Issue - 2, February - 2026

DOIs:10.2018/SS/202602014 --:-- Research Paper / Article / Review

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকালে বাংলার দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্রতায় সম্পদের নির্গমন এবং অবশিল্পায়নের প্রভাব

সুশান্ত দেবনাথ
স্নাতকোত্তর ডিগ্রি , ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
ই- মেইল: sushanta92ku@gmail.com

এবস্ট্রেক্ট: বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে ব্রিটিশ শাসনকাল ভারতীয়দের জন্য বহু বিপর্যয়ের কারণ। প্রাথমিক পর্যায়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং পরবর্তীকালে সরাসরি ব্রিটিশ সরকার দ্বারা ভারত শাসন যে ইতিহাস লিখে গেছে সেটি শোষণ, অত্যাচার ও লুণ্ঠনের ইতিহাস যা ভারতবর্ষের তৎকালীন সামগ্রিক শিল্প ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছিল। এই ধ্বংসাত্মক প্রভাব বাংলায় দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যতা বাড়িয়ে তুলতে যথেষ্ট ছিল। যাইহোক, এই গবেষণাধর্মী প্রবন্ধটির মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকালে বাংলার দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্রতায় সম্পদের নির্গমন এবং অবশিল্পায়নের প্রভাব কতটা ছিল তার পর্যালোচনা করা।

কি-রার্দস: অবশিল্পায়ন, ব্রিটিশ সরকার, দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্যতা, সম্পদ নির্গমন.

1. ভুমিকাঃ

আঠারো শতকের শেষ এবং বিংশ শতকের গোঁড়ায় ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ কোম্পানি ভারতবর্ষের কৃষি অর্থনীতি থেকে ব্যাপকভাবে সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী তাত্ত্বিক ও গবেষকদের মতে, ভারতীয় জনগণ ও দেশের দারিদ্র্যতার প্রধান কারণ – সম্পদের নির্গমন। প্রাথমিক পর্যায়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং পরবর্তীকালে সরাসরি ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সম্পদ লুঠ করে ইংল্যান্ডে নির্গমন করে। তাত্ত্বিকদের অনেকেই এবিষয়ে একমত ছিলেন যে সম্পদের নির্গমন বা নিষ্কাশনই ছিল ভারতের সার্বিক অর্থনৈতিক দুর্দশার মূলে। সম্পদের নির্গমন তত্ত্ব অনুযায়ী – ভারতবর্ষে বার্ষিক উৎপাদনের প্রায় পুরোটাই ইংল্যান্ডে রপ্তানি হত এবং বিনিময়ে ভারতবর্ষে যে সমস্ত পণ্য আসছিল তা ছিল প্রকৃতপক্ষে অপ্রতুল।

নিষ্কাশন তত্ত্বের মূল প্রবক্তা দাদাভাই নৌরজী। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির ভারতীয় অর্থনীতি ধ্বংশের মূল কারণ অনুধাবন করতে দাদাভাই নৌরজীর 'Poverty and Un-British Rule in India' এবং রমেশ চন্দ্র দত্তের দুটি খন্ডে প্রকাশিত 'The Economic History of India' গ্রন্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৬৭ সালে ২রা মে নৌরজী সর্ব প্রথম লন্ডনে ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনে "ভারতের কাছে ইংল্যান্ডের ধন" নামক পত্রিকায় সম্পদের নির্গমণ তত্বটি তুলে ধরেন। নৌরজী সেখানে তুলে ধরেন যে ভারতবর্ষে যে রাজস্ব আদায় হত তাঁর এক-চতুর্থাংশ প্রদেশ থেকে নিয়ে যাওয়া হত এবং ব্রিটেনের সম্পদ বৃদ্ধি করত। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের ক্রমাগত দারিদ্র্যতা বাড়তে থাকে। দাদাভাই নৌরজী তাঁর এই বক্তব্যকে শক্তিশালী করার জন্য বোম্বে থেকে প্রকাশিত দুটি সংবাদপত্র 'Native Opinion' ও 'Rast Goftar' - এ উদিয়মান ভারতীয় শিক্ষিতদের মতামত তুলে ধরার চেষ্টা করেন (নৌরজী, ১৯০১)।

১৮১৩ সালের চার্টার এক্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যর আধিপত্যের অবসান ঘটে (চট্টোপাধ্যায় ও গুহ রায়, ১৯৯৬)। কোম্পানির একচেটিয়া কারবারের অবসান এবং ব্রিটিশ বণিকদের বাণিজ্যের সুযোগের ফলে ইংল্যান্ড থেকে পণ্য আমদানি উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে যায়। এরফলে ভারতীয় অর্থনীতি বিশেষ করে চিরাচরিত গ্রামীণ অর্থনীতির ভাঙন শুরু হয়। ভারতীয় গ্রামভিত্তিক কৃষি অর্থনীতি ভেঙে পড়ে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলি ধ্বংস হতে শুরু করে। বাংলার ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৮১৩ সালের পর আমদানি ও রপ্তানি উভয় বাণিজ্যের যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটেছিল। ১৮১৩-১৪ সাল থেকে ১৮১৭-১৮ সাল পর্যন্ত বাংলা থেকে ভারতীয় পণ্য রপ্তানি ৪০% হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেখানে ব্রিটেন থেকে বাংলায় পণ্য আমদানি ৮৮% হারে বৃদ্ধি পেয়েছিলো। বাণিজিক ভারসাম্য বা 'balance of trade' ভারতের অনুকূলেই ছিল। ভারত থেকে ৬৯.৪ মিলিয়ন টাকার পণ্য ব্রিটেনে রপ্তানি হত। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয়

ছিল মূলত ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটেনে যেত শিল্পের কাঁচামাল, পরিবর্তে ব্রিটেন থেকে ভারতবর্ষে আসত শিল্পজাত পণ্য। রমেশ চন্দ্র দত্ত তাঁর 'The Economic History of India' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ১৮১৩ সালে কলকাতা বন্দর থেকে ব্রিটেনে ২ মিলিয়ন স্টার্লিং মূল্যের সুতিবস্ত্র পাঠানো হয়েছিল (দত্ত, ১৯০২)। ইংরেজ বণিকদের দ্বারা ভারতবর্ষ থেকে কৃষিজ কাঁচামাল শিল্পের উপকরণ হিসাবে ব্রিটেনে পৌঁছানো এবং ব্রিটেনের শিল্প উৎপাদিত পণ্য ভারতীয় বাজারে অনুপ্রবেশের গৃহীত নীতিই ভারতবর্ষের বুকে প্রাথমিক পর্যায়ে অবশিল্পায়ন ঘটানোর জন্য দায়ী।
সাধারভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে হস্ত শিল্পের বিপর্যয়কে ঐতিহাসিকরা অবশিল্পায়ন বলে আখ্যায়িত করেছেন। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে রমেশ চন্দ্র দত্ত, মহাদেব গোবিন্দ রানাডের মতো অর্থনীতিবিদরা বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে অবশিল্পায়নের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের মতে হস্ত শিল্পের বিপর্যয় ভারতীয় দেশীয় শিল্পের ধ্বংস করেছিল। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে অনেক ঐতিহাসিক ও গবেষক অবশিল্পায়ন শব্দের পরিবর্তে বি-শিল্পায়ন অথবা শিল্প বিনাশন শব্দ প্রয়োগের পক্ষপাতি। অবশিল্পায়নকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে ঐতিহাসিক সব্যসাচী ভট্টাচার্য বলেন - শিল্পায়নের লক্ষ্যন হল কৃষিকাজ থেকে উৎপন্ন জাতীয় আয়ের অংশের তুলনায় অনুপাতে শিল্পকর্ম থেকে উৎপন্ন আয়ের অংশ বৃদ্ধি, শিল্পকর্মে নিয়োজিত জন্যসংখ্যা কৃষিকর্মের তুলনায় অনুপাতে বৃদ্ধি পাওয়া।

2.সাহিত্য পর্যালোচনাঃ

অবশিল্পায়ন

ঐতিহাসিকরা ভারতবর্ষে অবশিল্পায়নের পেছনে অনেক কারণ উল্লেখ করেছেন। তাঁরা মনে করেন রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা অবশিল্পায়নের অন্যতম কারণ। অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে মারাঠা বর্গীদের হামলা, ছিয়াত্তরের মন্মন্তর, সন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ বাংলায় এক বিশ্বঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করে (বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৮৮২)। এই অরাজক অবস্থা অবশিল্পায়নের একটি অন্যতম কারণ ছিল (জীবন মুখোপাধ্যায়, ২০০২)। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করার উদ্দেশ্যে একদিকে এদেশ থেকে শিল্পের কাঁচামাল পাঠানো শুরু হল, অন্যদিকে, ইংল্যান্ড এর কারখানায় তৈরি সস্তা কাপড় বাংলা তথা ভারতবর্ষের বাজার ছেয়ে গেল। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র দত্ত, গোবিন্দ রানাডে, রজনী পাম দত্ত, নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ, অমিয় বাগচী প্রমুখ সকলেই একমত ছিলেন যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে কুটির শিল্পের অবলুপ্তি বা অবশিল্পায়নের প্রধান কারণ ছিল ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের অভিঘাত (জীবন মুখোপাধ্যায়, ২০০২)। রমেশ চন্দ্র দত্ত বলেছেন - ইউরোপের পাওয়ার লুমের আবিষ্কার ভারতীয় শিল্পের বিনাশকে সম্পূর্ণ করেছিল (রমেশ চন্দ্র দত্ত, ১৯০২-১৯০৪)।
১৮১৩ সালে অবাধ বাণিজ্য নীতি চালুর ফলে ভারতীয় শিল্প পণ্যের রপ্তানি কমিয়ে ব্রিটিশ শিল্প পণ্যের আমদানি বাড়িয়ে ভারতীয় সামগ্রীক শিল্প কাঠামোকে ইংরেজরা ধ্বংস করেছিল। রমেশ চন্দ্র দত্ত ভারতীয় সুতি বস্ত্র শিল্পের অবলুপ্তিকে ভারতীয় ইতিহাসের সবথেকে দুঃখজনক অধ্যায় বলে চিন্নিত করেছিলেন।
১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পর অবস্থার পরিবর্তন দ্রুত ঘটতে শুরু করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে অন্য ভারতীয় ও পাইকারি ক্রেতাদের বাংলা থেকে বিতাড়িত শুরু করে। এই যুদ্ধের পর কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা দস্তকের অপব্যবহার করে বাংলাদেশে বিনা শুল্কে অবাধ বাণিজ্য শুরু করে। এই অসম প্রতিযোগিতার ফলে দেশীয় বণিকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠে (জীবন মুখোপাধ্যায়, ২০০২)। ইতিমধ্যে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের জোয়ারের ফলে অনেক কম সময়ে অধিক ও সস্তা শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন শুরু হয়। এইরকম পরিস্থিতিতে, ব্রিটেনে ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসা বাণিজ্যর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়। ফলস্বরূপ, ভারতীয় বাজার ব্রিটিশ বণিকদের জন্য উন্মুক্ত করা করে দেওয়া হয়। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ তাঁর 'The Wealth of Nations' গ্রন্থে বলেন - ভারতবর্ষে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার আসলে ব্রিটেনের ব্যবসার পক্ষে ক্ষতিকর এবং ভারতের স্বার্থের বিরোধী। যাইহোক, ১৮১৩ সালের সনদ অনুযায়ী কোম্পানির একচেটিয়া কারবারের অবসান ঘটলে ইংল্যান্ডের বণিকদের ভারতীয় বাজারে ব্যপক ভাবে অনুপ্রবেশ ঘটা শুরু হয়। ইংল্যান্ডের শিল্প জাত দ্রব্য বিশেষ করে ম্যানচেস্টার ও লংকাশারায়ের কারখানায় প্রস্তুত সুতিবস্ত্র ভারতীয় বাজার পূর্ণ করতে থাকে। তবে ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের ধ্বংশের কয়েকটি কারণ দেখানো হয়, যেমন- ক। সস্তা বিদেশী পণ্যের আমদানি, খ। ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব, গ। ব্রিটিশ সরকারের সংরক্ষণ শুল্ক নীতি।
রাস ব্রক উইলিয়ামস, হ্যামিলটন প্রমূখ ঐতিহাসিকগণ বলেন যে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবই ছিল ভারতীয় শিল্প ও বানিজ্যের ধ্বংশের মূল কারণ - এর জন্য ব্রিটিশ সরকার দায়ী ছিল না। হস্ত শিল্প ও যন্ত্রচালিত শিল্পের মধ্যে বিরোধই এর মূল কারণ। অন্যদিক, রমেশ চন্দ্র দত্তের মতে, ব্রিটিশ সরকার অনুসৃত নীতিই ছিল ভারতীয় শিল্প ধ্বংশের মূল কারণ।

আর্থিক নিষ্কাশন

পলাশীর *যুদ্ধের* পর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে সমগ্র অষ্টাদশ শতক ধরে বাংলা থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ জলস্রোতের মতো ইংল্যান্ডে চলে যায়, কিন্তু বিনিময়ে ভারতবর্ষ কোনও উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা পায়নি। ঐতিহাসিকরা এই ঘটনাকে আর্থিক নিষ্কাশন, আর্থিক নির্গমন, সম্পদের বহির্গমন বা 'economic drain' বলে অভিহিত করেছেন। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অনেক গবেষক এই ঘটনাকে 'পলাশী লুণ্ঠন' বলে চিহ্নিত করেছেন। যাইহোক, এই আর্থিক নির্গমন মোটামুটি দুভাবে হয়েছিল – এক, বেসরকারিভাবে কোম্পানির কর্মচারী ও ইংরেজ বণিকদের দ্বারা বাংলার সম্পদ লুণ্ঠন এবং সেগুলি ইংল্যান্ডে পাঠানো; দুই, কোম্পানির বানিজ্য, আর্থিক ও রাজস্ব নীতির ফলে ভারতীয় সম্পদের লুঠ ও বিদেশে প্রেরণ। ১৭৫৭ সালের পলাশীর *যুদ্ধের* পর থেকে ১৭৬৫ সালের দেওয়ানী লাভ পর্যন্ত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা উৎকোচ, উপঢৌকন, নজরানা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে দেশে পাঠায়। এই অর্থের পরিমাণ ছিল তৎকালীন প্রায় ৫০ কোটি টাকা। ক্লাইভ ছিলেন এই লুণ্ঠনের পথপ্রদর্শক। ঐতিহাসিক পারসিভাল স্পিয়ার পলাশী পরবর্তী এই যুগকে "প্রকাশ্য ও লজ্জাজনক লুণ্ঠনের যুগ" (age of open and unashamed plunder) বলে অভিহিত করেছেন। ১৭৫৭-১৭৭১ সালের মধ্যে কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত অবৈধ বানিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর উপার্জন করে এবং তা ইংল্যান্ডে পাঠায়। ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ বলেন যে, উৎকোচ বা নজরানা অপেক্ষা কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বানিজ্য থেকে প্রাপ্ত আয় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

কোম্পানি ইংল্যান্ডের কিছু স্বাধীন বনিককে এদেশে বাণিজ্যের অনুমতি দেয়। এইসব লোভী ও দুর্নীতিপরায়ণ স্বাধীন ব্যবসায়ীরা বাংলার চাষি, তাঁতি ও বণিকদের ওপর জুলুম করে ও ভয় দেখিয়ে তাদের উৎপাদিত পণ্যাদি কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য করত। ইংরেজ বণিকরা আবার এইসকল দ্রব্য বাজারে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা লুটতো। কোম্পানির কর্মচারীরা এই বেআইনি অর্জিত অর্থ নানাভাবে স্বদেশে প্রেরণ করত। কোম্পানির কর্মচারীরা 'bill of exchange' মারফৎ ঐ টাকা স্বদেশে পাঠাতো। ইংরেজ কোম্পানির অনুসৃত নীতিও নানাভাবে সম্পদের নির্গমন ঘটাত। পলাশীর *যুদ্ধের* পূর্বে কোম্পানি ভারত থেকে বিভিন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় করে তা ইউরোপের বাজারে বিক্রি করত। এই কেনাকাটাকে বলা হত বিনিয়োগ। এজন্য কোম্পানি নিজের দেশ থেকে সোনা-রুপা বুলিয়ন আমদানি করত। পলাশীর *যুদ্ধের* পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং নবাব তৈরির ব্যবসা, দেওয়ানি লাভ প্রভৃতির মাধ্যমে কোম্পানির হাতে প্রচুর অর্থ আসে।

ডঃ যোগেশ চন্দ্র সিংহ বলেন যে - ১৭৬৬ থেকে ১৭৮০ এর মধ্যে এই বাবদ বাংলা থেকে মোট এক কোটি পাউন্ড ইংল্যান্ডে পাঠানো হত। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির প্রশাসনিক ব্যয় এবং বিনিয়োগ বাবদ খরচও যেত বাংলার রাজস্ব থেকে। ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠির মতে, ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতি বছর এই বাবদ গড়ে ২৫-৩০ লক্ষ টাকা বাংলা থেকে পাঠানো হত। কোম্পানির রাজ্য বিস্তারের জন্য *যুদ্ধ* খাতে যে বিপুল ব্যয় হয় তার বিরাট অংশ যেত বাংলার রাজস্ব থেকে। এসময়ের উল্লেখযোগ্য *যুদ্ধ* গুলির মধ্যে চারটি ইঙ্গ- মহীশুর *যুদ্ধ*, প্রথম মারাঠা *যুদ্ধ* এবং ইঙ্গ-ফরাসী *যুদ্ধের* কথা বলা যায়। ইংরেজ কর্মচারীদের মোটা বেতন, ইংল্যান্ডের ইন্ডিয়া অফিসের খরচ সবই মেটান হত বাংলার রাজস্ব থেকে।

ভারতীয় শিল্প বানিজ্যের ধ্বংসের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। শিল্প বানিজ্যের পরে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতীয় বানিজ্যের রুপান্তর ঘটল। ভারত একটি রপ্তানিকারক দেশ থেকে আমদানিকারক দেশে পরিনত হয়। তৈরি করা পণ্যাদির পরিবর্তে ভারত থেকে রপ্তানি হতে লাগল কাঁচা তুলা, রেশম, নীল, চা প্রভৃতি কাঁচামাল। ভারত পরিনত হল ব্রিটেনের শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশে। শিল্প বানিজ্যের ধ্বংসের ফলে দেশে প্রবল বেকারত্ব দেখা দেয়। বেকার শিল্পী ও কারিগররা অন্য পেশায় মন দেয়। এবং অধিকাংশই কৃষিকাজে যুক্ত হয়। চিরাচরিত অর্থনীতি ধ্বংসের ফলে ভারত একটি দরিদ্র্য দেশে পরিণত হয়। দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ভারতীয় জীবনের অঙ্গে পরিণত হয়। বিপান চন্দ্র বলেন যে ১৮১৩ সালের পর থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য নীতি ব্রিটিশ শিল্প ও শিল্পপতিদের স্বার্থে পরিচালিত হয়েছিল।

১৮১৩ সালে অবাধ বানিজ্য নীতি হবার পর ভারতীয় শিল্প পণ্যের রপ্তানি কমিয়ে এবং ব্রিটিশ শিল্প দ্রব্যের আমদানি বাড়িয়ে ভারতীয় শিল্পকে ইংরেজরা ধ্বংস করেছিল। ১৮১৮ সালে ঢাকার কুঠি বন্দ করে দেওয়া হয়। ১৮২৫ সালের মধ্যে শিল্প কেন্দ্রগুলির এই অবনতি সম্পূর্ণ হয় এই বস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে কর্মরত কারিগর ও তাঁতিরা পেশা চ্যুত হয়ে পড়ে। একটি হিসাব থেকে জানা যায় কেবলমাত্র বাংলা থেকেই ১০ লক্ষ মানুষ তাদের জীবিকা হারিয়েছিল।

ইংরেজ কোম্পানি অনুসৃত সরকারী নীতি বাংলা থেকে আর্থিক নির্গমনের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলেছিল। ইংরেজ কোম্পানির বানিজ্য নীতির ফলে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দ্রুত হারে বাংলার সম্পদ বাইরে চলে যেতে থাকে। বাংলার সম্পদ নিস্কমনের ফলে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নিয়েছিল ইংরেজ কোম্পানির ভারতে বাণিজ্যের জন্য বিনিয়োগ। ১৭৫৭ সালের আগে পর্যন্ত কোম্পানি এসব পণ্য ক্রয় করার জন্য ইংল্যান্ড থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনা-রুপা বা বুলিয়ন বাংলায় আমদানি করত। কিন্তু ১৭৬৫ সালের পর পরিস্থিতি একেবারেই পালটে যায়। দেওয়ানী বা বাংলার রাজস্বের উপর একচেটিয়া অধিকার লাভের পর কোম্পানিকে আর ইংল্যান্ড থেকে সোনা-রুপা বা বুলিয়ন আমদানি করতে হয়নি। বাংলা থেকে তারা যে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় করত তা দিয়েই তারা রপ্তানি যোগ্য ভারতীয় পণ্য ক্রয় করতে থাকে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে এবং ঊনিশ শতকের গোঁড়ার দিকে কোম্পানি ভারতে তার সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যে যুদ্ধ বিগ্রহ চালিয়েছিল তার ব্যয়ভার বহন করেছিল বাংলার রাজস্ব।
সুতরাং দেখা যায় যে ইংরেজ কোম্পানির বানিজ্য নীতির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল – এদেশ থেকে অর্জিত অর্থ এদেশের পণ্য ক্রয় করার জন্য বিনিয়োগ করা। ১৭৫৭ সালের পর কোম্পানি এদেশে ব্যাপক লুণ্ঠন চালিয়ে যে সম্পদ সংগ্রহ করেছিল তার অবশিষ্ট অংশ দিয়ে রপ্তানি পণ্য ক্রয় করে ইউরোপের বাজারে চালান দিয়েছিল। ফলে ১৭৫৭ সাল থেকে কোম্পানি দ্বারা এদেশ থেকে পণ্যের মাধ্যমে আর্থিক নির্গমন শুরু হয়ে যায়।

3.উদ্দেশ্যঃ

এই গবেষণাধর্মী প্রবন্ধটির শিরোনামে দুটি প্রধান উপাদান লক্ষণীয়। একদিকে রয়েছে স্বাধীন উপাদান হিসাবে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার ভুমিকা এবং অপরদিকে রয়েছে নির্ভরশীল উপাদান হিসাবে বাংলার দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যতা। এই দুটি উপাদানকে মাথায় রেখে গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকালে বাংলার দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্রতায় সম্পদের নির্গমন এবং অবশিল্পায়নের প্রভাব কতটা ছিল তার পর্যালোচনা করা।

4.মূল্যায়নঃ

মার্কিন গবেষক মরিস ডি মরিস এর মতে, অবশিল্পায়নের পুরো ব্যাপারটি হল ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের দ্বারা বহুল প্রচারিত একটি নিছক 'অলিক কল্পনা বা মিথ'। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা এর উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা শিল্প দ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধি মানেই অবশিল্পায়ন ধরে নিয়ে ভুল করেছেন। শিল্প দ্রব্যের আমদানির ফলে কোন কোন দেশীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অন্য দেশীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে পারে। উনিশ শতকের সূচনায় সুতো আমদানির ফলে ভারতীয় সুতো কাটনিরা মার খায়। ভারতীয় কুটির শিল্পের একটি নিজস্ব বাজার ছিল, যেখানে কোন বিদেশি প্রতিযোগিতা ছিল না। তাই মরিসের বক্তব্য এই সময়ে ভারতে কোন অবশিল্পায়ন ঘটেনি। বরং আর্থিক উন্নয়নই হল এযুগের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য। জাপানী ঐতিহাসিক তরুমাতসুই ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে মরিসের যুক্তি খণ্ডন করেছেন। অর্থনীতিবিদ ডঃ অমিয় বাগচি পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছেন যে ১৮০৯ থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে গাঙ্গেয় বিহারে কুটির শিল্পের উপর নির্ভরশীল কারিগরের সংখ্যা মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। ডঃ সব্যসাচী ভট্টাচার্য, ডঃ তপন রায় চৌধুরী, ডঃ বিপান চন্দ্র কেউই মরিসের বক্তব্য গ্রহন করতে রাজি নন। তাঁদের মতে অবশিল্পায়ন একটি বাস্তব সত্য।
থিওডর মরিসন, পি জে মার্শাল প্রমুখ ইংরেজ ঐতিহাসিকরা অবশ্য গোটা প্রক্রিয়াটিকে বাংলা থেকে একতরফা সম্পদের নিষ্কমন বা প্রতিদানহিন চালান বলে মেনে নিতে চাননি। কোম্পানি বাংলায় বিমা, বাঙ্কিং, এজেন্সি হাউস, জাহাজ শিল্প পাশ্চাত্য প্রযুক্তির প্রয়োগ প্রভৃতি বিভিন্ন খাতে তার অর্জিত আয়ের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছিল। সুতরাং তাঁদের মতে, বাংলা যে কেবলই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তা বলা চলে না। বাংলা তথা সমগ্র ভারতকে ব্রিটেনের উপনিবেশ করে রাখার তাগিদেই কোম্পানি এখানে কিছু ব্যয় করতে বাধ্য ছিল। বাংলায় কিছু কিছু খাতে তারা ব্যয় করেছিল বলেই যে তারা বাংলার বিপুল পরিমাণ সম্পদ বিদেশে চালান করে বাংলার অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেনি – এই সত্য প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। পলাশী পরবর্তী লুণ্ঠন ও বাংলার আর্থিক নিষ্কমন বাংলার অর্থনীতিকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। রপ্তানি বানিজ্যের পুঁজি বাংলা থেকেই সংগৃহীত হত বলে ইংরেজ কোম্পানি তথা অন্যান্য ইউরোপিয়ান কোম্পানি বিদেশ থেকে সোনা-রুপা আমদানি বন্ধ করে দেয়। তাছাড়া, বিপুল পরিমাণ অর্থ, সোনা, রুপা ও পণ্যের মাধ্যমে বেরিয়ে যাওয়ার ফলে বাংলার অর্থনীতিতে স্থবিরতা এসেছিল। এই অর্থনৈতিক স্থবিরতা টাকার বাজারের উপর অবাঞ্ছিত চাপ সৃষ্টি করেছিল।
পলাশী পরবর্তীকালে ইংরেজ কোম্পানি ও বেসরকারী বণিকদের উদ্যোগে বাংলার রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে ভারতীয় বণিক বা উৎপাদকরা মোটেও লাভবান হয়নি। বাণিজ্যে ভারতীয় বণিকদের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছিল। আর্থিক নিষ্কমনের কুপ্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে রমেশ চন্দ্র দত্ত বলেছিলেন যে দেশের সম্পদ বাইরে চলে যাওয়ার ফলে আর্থিক নিষ্কমন ব্যাপকভাবে হয়েছিল (রমেশ চন্দ্র দত্ত, ১৯০২, ১৯০৪)। যা পৃথিবীর সবথেকে সম্পদশালী দেশগুলিতে ঘটলে সেগুলিও দরিদ্র্য হয়ে যেত। এই ঘটনা ভারতবর্ষকে দুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত করেছিল। বাংলা থেকে আর্থিক নিষ্কমন বাংলাকে দরিদ্র্যতর করলেও তা গ্রেট ব্রিটেনকে বিত্তশালী করেছিল – এবিষয়ে সন্দেহ নেই। ঐতিহাসিক রজনী পাম দত্ত 'India Today' গ্রন্থে বলেছেন – ভারত থেকে অপহৃত সম্পদের ভিত্তিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক ইংল্যান্ড গড়ে উঠেছিল। দার্শনিক কার্ল মার্ক্স তাঁর 'Das Capital' এর তৃতীয় খণ্ডে বলেছেন ভারত থেকে নিষ্কাশিত সম্পদই ইংল্যান্ডের পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। এদেশ থেকে চালান হওয়া সম্পদ ইংল্যান্ডের এক শ্রেণীর মানুষকে অর্থশালী করে তোলে এবং তারা এই সঞ্চিত অর্থ ইংল্যান্ডে শিল্প ও বাণিজ্যে বিনিয়োগ করেছিল। সুতরাং ভারত থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজির অন্যতম উৎস হিসেবে কাজ করেছিল-একথা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না (কার্ল মার্ক্স, ১৮৬৭)।

তথ্যসূত্র :

১। Bandyopadhyay, Sekhar. (2004). From Plassey to Partition and After: A History of Modern India. Hyderabad: Orient BlackSwan.

২. Datta, Rajani Pam. (1940). India Today. Bombay: Left Book Club Edition.

৩. Dutt, Romesh Chandra (1902). The Economic History of India: Under Early British Rule (vol.1). London: Trubner.

৪. Marx and Friedrich Engels. (1909). Das Capital (vol.3). Chicago: Charles H. Kerr and Co.

৫. Naoroji, Dadabhai (1901). Poverty and Un-British Rule in India. London: Swan Sonnenschein & Co., Lim.

৬. Sen, Amartya (1981). Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation. New Delhi: Oxford University Press.

৭. Smith, Adam (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London: W. Strahan and T. Cadell.

৮. ভট্টাচার্য, সব্যসাচী (২০০৫)।ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি। কলকাতাঃ প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার।

৯. চট্টোপাধ্যায় ও সিদ্ধার্থ গুহ রায় (১৯৯৬)। আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৭০৭-১৯৬৪)। ক্যালকাটাঃ প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার।

১০. মুখোপাধ্যায়, জীবন (২০০২), আধুনিক ভারত (১৭৫৭-১৯৫০)। কলকাতাঃ শ্রীধর পাবলিশার।

১১. রায়, রনেশ (২০০১)। ঔপনিবেশিক ভারতের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি। কলকাতাঃ প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার।